তৃণাদের বাসায় অনেক দিন যাওয়া হয়না। শিলির দূরসম্পর্কের আত্মীয় হন তৃণার বাবা হাসেম ভাই। কিন্তু তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার মূল কারণ আত্মীয়তা নয়। তার তিনটি মেয়েঃ তৃণা - দশ, পুষ্পা - ছয় এবং উর্মিলা - তিন। প্রথম দর্শনেই আমরা স্বামী-স্ত্রী এই মেয়ে তিনটির মোহে আটকে গেছি। আশা ছিল আমাদের প্রথম সন্তান একটি মায়াময়ী কন্যা হবে। যাকে পেয়েছি, তার মেজাজের বহরে জীবন অতিষ্ঠ। একটি খুব আনন্দদায়ক পরিবেশকেও এই ক্ষুদ্র শর্মাটি নিমেষে তিক্ততায় পূর্ণ করতে পারে। বড়ই ঝামেলা হয়।

হাসেম ভাই মালয়েশিয়ায় কুয়ালালামপুরের নিকটবর্তী একটি ইউনিভার্সিটিতে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোনো একটি বিষয়ে পড়াতেন। টরোন্টোতে নিবাস গেড়েছেন বছর তিনেক হলো। বন্ধু বৎসল। এক গাস পানি চাইলে মোগলাই খানা এনে হাজির করেন।

শিলির বাড়াবাড়ি পছন্দ নয়। হাসেম ভাইয়ের আতিথেয়তায় আতিশয্য হলেই সে ভ্রূ কুঁচকে ফেলে। "হাসেম ভাই, সব কিছু এমন বেশি বেশি করবেন না। একদম ভালো লাগে না। "

হাসেম ভাই তাকে স্নেহ করেন। তিনি এই জাতীয় কথায় ঝকঝকে দাঁতের রাশি দেখিয়ে শিশুদের মতো খিলখিলিয়ে হেসে ওঠেন।

এই ধরনের ব্যবহারে শিলির বিরক্তির কাটা দ্রুত উর্ধে ধাবিত হয়। "হাসেন কেন? হাসির কথা তো কিছু বলিনি।"

হাসেম ভাইয়ের সুরেলা হাসিতে নতুন ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়।

মাস দুয়েক আগে পুষ্পার ষষ্ঠ জন্মদিনে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ দেয়া হলেও যেতে পারিনি। প্রজেক্টের কাজে মন্ট্রিঅল যেতে হয়েছিল। ফিরে এসে শুনেছি দিনটি খুব ধুমধামের সঙ্গেই পালিত হয়েছিল। তৃণার নাচে-গানে ভয়ানক আগ্রহ।

জুলেখাভাবীও অত্যন্ড় সংস্কৃতমনা। অতীতে কোনো এক সময় হয়তো শখের বশে কিছু নাচ-গান শিখেছিলেন। সাধ্যমতো শিখিয়েছেন বড় মেয়েটিকে। যদিও হিন্দি ছবির কল্যাণে এখানকার অল্প বয়স্ক মেয়েগুলোর নাচের নানান ভঙ্গি আয়ত্ত হয়ে যায়। তাদের পোশাক-আষাক ও চলনে-বলনে যে নাটকীয়তা নজরে পড়ে তাতে হাসি চাপা দায় হয়ে পড়ে।

তৃণার কয়েকটি সাগরেদ আছে। একই তলায় আরেকটি সিলেটি পরিবারের বাস। তাদের আট বছরের মেয়ে ডেইজি তৃণা আপু বলতে অজ্ঞান। সর্বক্ষণ নাকি এ বাসাতেই তার আস্তানা।

ছয় সাত বছরের নাজরা থাকে ঠিক উপরের তলায়। তারা পাকিস্তানের। বাবা-মা দুজনই কাজ করেন বলে নাজরাকে স্কুলের পরে তৃণার সঙ্গেই সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকতে হয়। জুলেখাভাবীর ভাষ্য অনুযায়ী এ বাসাতে সে এতো স্বাচ্ছন্দ বোধ করে যে প্রায়ই এখানেই রাত যাপন করে।

যাহোক ডেইজি, নাজরা, পুষ্পা ও উর্মিলাকে নিয়ে তৃণার নাট্যসংঘ। জানা গেল মুম্বাই-র যাবতীয় হিট সিনেমাগুলোর নাচে-গানে তাদের পারদর্শিতা অন্যের ঈর্ষা উদ্রেককারী হলেও সেটাই তাদের একমাত্র গুণ নয়, তারা অভিনয় শিল্পেও সমভাবে পারদর্শী। পুষ্পার জন্মদিনে অনুপস্থিত থাকায় তাদের শৈল্পিক কর্মকান্ড কিছুই দেখা হয়নি। আজকের এই আসা যেন তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে। ভিডিওতে শুধু যে দেড় ঘন্টার অনুষ্ঠানটি অনড় বসে থেকে দেখতে হলো তাই-ই-নয়, আমাদেরকে জানানো হলো, শুধু আমাদের সম্মানে এই প্রতিভাময়ীদের দলটি একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। মনে মনে প্রমাদ গুণলাম। মুখে অবশ্য অর্ধচন্দ্রের মতো কর্ণ-টু-কর্ণ হাসি ঝুলিয়ে রাখলাম। তৃণাদের প্রস্তুতি পর্ব চললো বেশ কিছুক্ষণ। বাক্স খুলে রঙবেরঙের ঘাগরা বের হলো। কে কোনটি পরবে তা নিয়ে কিঞ্চিৎ ঠেলাঠেলি, মনোমালিন্য এবং পরিশেষে উর্মিলার উদাত্ত ক্রন্দন। বেডরুমে দরজা বন্ধ করে রিহার্সাল চললো।

জুলেখা ভাবী এই অবসরে আরেকটি অপকর্ম করলেন। তিনি চুলায় পোলাও-কোর্মা বসিয়ে দিলেন। এমন কুবুদ্ধি কার মস্ড়িষ্ক থেকে আসতে পারে সে তো জানাই। কিন্তু হাসেম ভাইকে ঝাড়ি মারার সুযোগ হলো না। তার আগেই তিনি কেটে পড়লেন ডেইজি ও নাজরার বাবা-মায়েদেরকে আমন্ত্রণ জানানোর অজুহাত দিয়ে।

অধিকাংশ ছুটির দিনেই তাদের কারো না কারো কাজ থাকে। আজ গ্রহে নক্ষত্রে এমনই মিলেছে যে সকলেই বাসায়। ভেবেছিলাম ঝট করে এসে দেখা করে ফুটে যাবো। বস্তুত মেলা বসে গেল। খাওয়া দাওয়া, নাচ-গান, কিছু সুখ - দুঃখের গল্প। মন্দ নয়। যদিও গ্রীষ্মে মাঠে ঘাটে না কাটাতে পারলে শরীর নিষপিষ করে, মনে হয় দিনটা আঠারো আনাই মিছা। কিন্তু এই মায়াময়ী মেয়েগুলো শখ করে কিছু একটা করছে। কোন মুখে যাই!

জাকিকেও দেখলাম খুব উৎসাহের সঙ্গে তৃণার পিছু পিছু ছুটছে। পুষ্পা ওকেও একটি ঘাগরা পরানোর চেষ্টা করতে গিয়ে অবশ্য প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়ে পিছিয়ে গেছে। বেডরুম থেকে হিন্দি গানের বাজনা আর বাচ্চাগুলোর কলকাকলি শুনে বুঝলাম তাদের অন্তত সময়টা ভালো কাটছে।

হাসেম ভাইয়ের সঙ্গেই ডেইজির বাবা-মা চলে এলেন। ভদ্রলোকের নাম মহব্বত আলী। তার স্ত্রীর নাম ডালিয়া। উভয়েই অত্যন্ড় হাসি-খুশি স্বভাবের। মহব্বত ভাই ফুর্তিবাজ মানুষ। আলাপের শুরুতেই একটি কৌতুক করে হো হো করে হাসতে লাগলেন। হাসেম ভাইকেও গলা মেলাতে দেখে আমিও বোকার মতো হাসতে গিয়ে দুটি ঢেকুরের মতো শব্দ করলাম। মহব্বতভাইয়ের কথাবার্তা সবই খাস সিলেটি ভাষায়। দুই চারটি শব্দের বাইরে কিছুই বুঝতে পারছি না।

নাজরার বাবা মোহাম্মদ নিয়াজ ও মা নাজমা শিগগিরই এসে হাজির হলেন। নিয়াজ ভাই মধ্যবয়সী, কিঞ্চিৎ ঠান্ডা স্বভাবের।

নাজমা আজানুলম্বিত বোরখা পরে এসেছেন। চোখের স্থানে নামকাওয়াস্ড়ে ফাঁকা। তিনি দ্রুত পায়ে হেটে রন্ধনশালায় নারী মহলে চলে

গেলেন। এমন গরমের দিনে এই পোশাকের নিচে বেচারীর করুণ অবস্থা বিবেচনা করে ক্ষণিকের জন্য চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েছিলাম। মহব্বত ভাইয়ের সতেজ হাসির আওয়াজে বাস্তবে ফিরে এলাম।

নিয়াজ ভাইকেও খুশি মনে হাসতে দেখে জিজ্ঞাসু নয়নে তাকাতেই তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে উর্দুতে বললেন, "ভায়া, কিছু না বুঝলেও হাসতে তো মানা নেই, ভাইসাহেব খুশি হন।"

মহব্বত ভাই সেই মন্তব্যে কিঞ্চিৎ মনঃক্ষুণ্ন হয়ে তার কৌতুকগুলো ইংরেজিতে অনুবাদ করে বলার চেষ্টা করতে লাগলেন। তার ইংরেজিতে বুৎপত্তি ন্যূনতম। শিগগিরই কৌতুকে ক্ষান্ত দিয়ে দৈনন্দিন জীবনের আলাপে মগ্ন হয়ে গেলাম আমরা।

হাসেম ভাইয়ের কল্যাণে মহব্বত ভাইয়ের সঙ্গে আলাপচারিতা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো। ভদ্রলোক দেশে বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। এখানে এসে একটি খাবারের দোকান খুলে বসেছেন। মোটামুটি চলছে। কিন্তু খাটুনি খুবই বেশি। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই প্রায় সর্বক্ষণ সেখানেই পড়ে থাকেন। মাঝে মধ্যে দুটি অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়ে তাদের পরিবর্তে কাজ করে। আজ তেমন একটি দিন।

নিয়াজভাই বড় একটি ওষুধ কম্পানির হোমড়া-চোমড়া গোছের কেউ ছিলেন। এখানে আসা পর্যন্ত গার্ডের কাজ করেন ডাউনটাউনের একটি বিল্ডিংয়ে। কাজটি নিতান্ত মন্দ নয়। কিন্তু দীর্ঘ দিন এই কাজ করতে তার আগ্রহ নেই। তিনি কোয়ালিটি কন্ট্রোল-এর ওপর একটি কোর্স করছেন। আশা আছে ভালো কিছু একটা হয়ে যাবে।

আমাদের আলাপে বিঘ্ন ঘটিয়ে সহাস্য মুখে তৃণা ঘোষণা দিল, "আজকের শিল্পানুষ্ঠান এখনই শুরু হতে যাচ্ছে। সুধীমন্ডলী, অনুগ্রহ পূর্বক করতালি দিয়ে আমাদের শিল্পীদেরকে অভিনন্দন জানান।"

প্রবল করতালি ম্রিয়মাণ হওয়ার আগেই ঘাগরায় ঢেউ তুলে আর ঘুঙুরে ছন্দ জড়িয়ে শুর হলো নৃত্য। জাকি ও উর্মিলা সেই নৃত্যে যোগ দেয়ায় সব কিছু ভন্ডুল হয়ে যাবার উপক্রম হলো। শেষ পর্যন্ত আমাদের হস্তক্ষেপে আনাড়ি দুজনকে আপাতত সরিয়ে আনা সম্ভব হলেও তাদের তীক্ষ্ণ প্রতিবাদী চিৎকারে গান চাপা পড়ে গেল।

জনতার এমন অযাচিত ব্যবহারে মনঃক্ষুণ্ন হয়ে অনুষ্ঠান কাটছাট করে একটি ট্যালেন্ট শো সংযোজন করলো তৃণা। উর্মিলা মঞ্চে উঠে 'ধিন-তাকা-ধিন-তাকা' করে দুই পাক টলমল পায়ে চক্কর দিয়ে সকলের হৃদয় জয় করে নিল।

জাকির পালা আসতে সে স্বভাবসিদ্ধভাবে একটি অভাবনীয় নাটকীয়তার সূচনা করলো। সে এখন আর নৃত্যে আগ্রহী নয়। তার এখন ছবি আঁকতে ইচ্ছা হচ্ছে। কাগজ ও রঙ পেন্সিল চলে আসতে সে অভিজ্ঞ চিত্রকরের মতো আঁকিবুকি আঁকতে শুর করলো। স্পাইডারম্যান আঁকা দিয়ে তার অংকনে হাতেখড়ি হয়েছিল। সেই থেকে নিজ প্রচেষ্টাতেই তার দক্ষতা যথেষ্ট বেড়েছে বলেই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। আমাদের অ্যাপার্টমেন্টটির অভ্যন্তরে দেয়ালে দেয়ালে নানান জাতীয় সুপার হিরোদের নানান ভঙ্গির বিচিত্র বর্ণের সব চিত্র যে হারে শোভা পাচ্ছে তাতে পিতা-মাতার হৃদয়ে শংকার সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। চিত্রশিল্পী ও গাজার কলকে এই বস্তু দুটির ঘনিষ্ঠতা অপরিহার্য বলেই মনে হয়।

পুষ্পা স্নেহমাখা কণ্ঠে বললো, "ও বোধ হয় বড় হয়ে আর্টিষ্ট হবে।"

উদ্বেগ অনুভব করি। রক্ষা করো বিধাতা!

খাওয়ার ডাক পড়লো। এই পর্বটি আমার সবচেয়ে প্রিয়। ইদানিং অবশ্য শিলির কটুক্তি যথেষ্ট বিরক্তির উদ্রেক করছে। আমার উদর এলাকার চুল পরিমাণ স্ফীতিও তার নজর এড়ায় না।

ভোজনের পালা চুকতে তিন কন্যা আমাকে চেপে ধরলো কোনো একটি তেলেসমাতি কান্ড করার জন্য। এবার আমার ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার করার পালা। সমগ্র জীবন যে অন্যের ট্যালেন্ট দেখে দেখেই কেটে গেল সে কথা এই মেয়েগুলোকে কি করে বোঝাই? বাল্যকালে ক্যাডেট কলেজে পড়ার সুবাদে এক সোনাঝরা দিনে রাজ্যের মানুষের সামনে মঞ্চে উঠেছিলাম কবিতা আবৃত্তি করতে। কবিতার নাম, Mary's little lamb. কিন্তু বিধির কি বিধান। সমগ্র সপ্তাহ ধরে কণ্ঠস্থ করার পরও শত আঁখির সম্মুখে দাঁড়িয়ে এমনই ভড়কে গেলাম যে প্রথম দুটি লাইন কোনোক্রমে বলে সেই যে প্রস্তরীভূত হয়ে গেলাম মঞ্চের পেছন থেকে জনৈক বড়ভাইয়ের শত হইচইয়েও কোনো বিকার হলো না। এ লজ্জা রাখি কোথায়? তৃণার শত অনুরোধেও অনড় রইলাম। শিশুরা যেমন সহজে মানুষকে ইজ্জত দেয় তেমনি বেইজ্জতির ব্যাপারগুলো দীর্ঘ দিন মনে রাখে। এই বয়সে নতুন কোনো ঝুঁকি নিতে রাজি নই। হাসেম ভাইকে সঞ্চয়িতা হাতে ধরিয়ে দিতে তিনি একটির পর একটি কবিতা আবৃত্তি করে আমাকে এই যাত্রা রক্ষা করলেন।

জুলেখা ভাবী আজকের দিনটিকে আরো আনন্দময় করে তোলার জন্য নিজেই একটি বড়সড় কেক বানালেন। দুর্ভাগ্যবশত ওভেনের কোনো ত্রুটির কারণে বস্তুটি বিশেষ সুবিধাজনক হলো না।

পুষ্পার হাস্যময় মুখখানি মলিন হয়ে উঠলো। সে ব্যথাতুর কণ্ঠে বললো, "দোকানে কতো সুন্দর সুন্দর কেক পাওয়া যায়। আমরা কানাডা এসে গরিব হয়ে গেছি।"

তার কথাগুলো যেন বোমের মতো পড়লো। আমি ও শিলি উভয়েই ভয়ানক অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। জন্ম পর্যন্ত দেখে আসছি গরিব গ্রাম-গঞ্জে, শহরে। সেটা আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মন খারাপ করার মতো

কোনো বিষয় নয়। কিন্তু একটি প্রিয় বালিকার মুখে যখন দারিদ্রের কথা আসে তখন সমগ্র হৃদয় আনচান করে ওঠে।

আমি একটা কেক নিয়ে আসার প্রস্তাব দিতে হাসেম ভাই ও ভাবী উভয়েই ভয়াবহ আপত্তি তুললেন। জানা গেল, পুষ্পার প্রকৃত জন্মদিনে সত্তর ডলার দিয়ে বিশাল কেক নিয়ে আসা হয়েছিল। আজ জুলেখা ভাবীই বানিয়েছেন কারণ তার কেক বেশ মজা হয়। কোনো কারণে আজই গড়বড় হয়ে গেল। মেয়েকে নীরব দৃষ্টিতে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন ভাবী।

মেয়ে তাকালো বাবার দিকে সমর্থনের আশায়।

হাসেম ভাইয়ের মেয়ে - অন্ড়প্রাণ। তিনি তরল কণ্ঠে বললেন, "ও তো মিছা কিছু কয় নাই। মালয়েশিয়ায় আমাগো কতো বড় বাংলো বাড়ি আছিল, গাড়ি আছিল, ড্রাইভার আছিল, যেখানে মন চাইতো যাইতাম গিয়া। আর অহন একটা গাড়িও নাই। মাইয়াগুলা কোথাও বেড়াইতে যাইতেও পারে না। কি কও পুষ্পা, ঠিক কইছি?"

পুষ্পা ফ্যাকাসে মুখে হ্যাঁ সূচক ভঙ্গি করলো। তৃণা যোগ করলো, "মালয়েশিয়ায় আব্বুও কতো টাকা পেতেন। আমরা কতো কি করতে পারতাম। "

স্বাভাবিকভাবেই জানতে চাইলাম, "এলেন কেন? "

হাসেম ভাই হেঃ হেঃ করে অর্থহীনভাবে হাসলেন।

"আইলাম পোলাপাইনের ল্যাহাপড়ার কথা ভাইবা। যেহানে ছিলাম ভালা ইংলিশ স্কুল আছিল না। হেরা মালয় ভাষায় পড়তো। অগো জন্যেই তো সব, ঠিক না? ঠিক না? তয় আবার যামু গিয়া ভাবতাছি। কাম হয়তো অহনও অইতে পারে। কি আম্মারা, তোমরা যাইবা? "

সম্মিলিত কণ্ঠের প্রত্যুত্তর এলো, "না-আ-আ।"

বিস্মিত কণ্ঠে বললাম, "কেন? "

তৃণা ও পুষ্পার সম্মিলিত জবাব, "এখানে স্কুল ভালো।"

শুনে ভালো লাগলো যে, এই সাময়িক অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যেও মেয়েগুলো একটি আনন্দময় দিক খুঁজে পেয়েছে। পাবলিক স্কুলে লেখাপড়া সম্পূর্ণ ফ্রি। উপরন্তু বাবা মায়ের উপার্জনের ওপর নির্ভর করে সরকার সন্তানদের জন্য মাসিক ভাতা দিয়ে থাকে। সেটি খুব বেশি নয়। তবুও কিয়ৎ পরিমাণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দিতে পারে।

নিয়াজ ভাই বললেন, "আমাদের সকলেরই এক অবস্থা। আমার মেয়েটাও ঘন ঘন অভিযোগ করে। কিন্তু সব ভালো যার শেষ ভালো তার। আল-াহর ইচ্ছায় মেয়েটির লেখাপড়া ভালো হবে। সে অনেক বড় হতে পারবে।"

সব ছেড়েছুড়ে দেশান্ড়রি হওয়ার ভালো-মন্দ দুটি দিক নিয়েই আলাপে নিমজ্জিত হয়ে পড়ি আমরা।

ছেলেমেয়েরা খেলায় মেতে ওঠে।

মহব্বত ভাই দুর্বোধ্য কৌতুক চালিয়ে যেতে থাকেন।

দ্বিতীয় দফা চায়ের প্রস্তাব উঠতেই অবশ্য আসর ভেঙে গেল।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হওয়ার উপক্রম। মহব্বত ভাইকে দোকানে যেতে হবে। নিয়াজভাইকে যেতে হবে কাজে। আজ তার রাতে ডিউটি। স্পষ্টতই এই কাজে তার মনোযোগ নেই, আগ্রহও নেই। কিন্তু অন্যান্য অনেক কাজের চেয়ে শান্ড়ায় এবং মেডিকাল ইনশিওরেন্স আছে বলে তিনি লেগে আছেন। এ দেশে সরকার চিকিৎসা ফ্রি রাখলেও সব কিছুর খরচ বহন করে না। ওষুধ, দাঁত, চোখের জন্য পৃথক ইনশিওরেন্স কিনতে হয়। অল্প মানুষই কেনে।

নিয়াজ ভাই বিদায় নেয়ার আগে ম্লান হেসে বললেন, "দেশেও সমস্যা ছিল। নানান ধরনের অপ্রীতিকর কাজ করতে হতো। আর্থিক সমস্যাটা ছিল না। এটুকুই ভালো ছিল।"

নাজমা বোরখার অভ্যন্ড়র থেকে ধিক্কার দিলেন, “কতো করে বলেছিলাম যেও না। এবার? সুখে থাকলে ভূতে কিলায়।”

এ কথায় হাসেম ভাই খুব হাসতে লাগলেন। “ ঠিক বলেছেন ভাবী। বহুৎ ঠিক বলেছেন। এয়সা বাত কিয়া তোম! হাঃ হাঃ হাঃ। সুখে থাকলে ভূতে কিলায়। ”

নিয়াজ ভাই শ্রাগ করে বললেন, “ছিলেম খচ্চর, হলেম গর্দভ! ”

সকলে বিদায় নিতে এবার আমাদের যাবার পালা এলো। তৃণা, পুষ্পা ও উর্মিলাকে আদর করে, শিগগিরই তাদেরকে আমাদের বাসায় বেড়াতে নিয়ে যাবার প্রতিশ্র“তি দিয়ে বিদায় নিলাম। মনটা কিঞ্চিত ভারাক্রান্ড়। তবুও এই ভেবে ভালো লাগলো একদিন এই মেয়েগুলি অনেক বড় হবে এবং তখন এই দিনগুলির কথা ভেবে সাফল্যের সত্যিকারের আনন্দটুকু উপভোগ করতে পারবে।